চতুর্থ অধ্যায় (পর্ব-২)

চোখের সামনেই ঘটছে বিবর্তন!

বন্যা আহমেদ

পূর্ববর্তী পর্ব (পর্ব-১)-এর পর ...

কেনো ডি ডি টি দিয়ে আর ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না?

আমাদের মত দেশগুলোতে তো ম্যালেরিয়া কোন নতুন বিষয় নয়। আমরা সেই ছোটবেলা থেকেই জেনে এসেছি যে এ্যানোফিলিস নামের এক ধরণের মশার মাধ্যমেই এই ম্যালেরিয়া ছড়ায়। এই রোগের জীবাণুটা এক ধরণের পরজীবী প্রটোজোয়া (protozoa) যা রোগীর রক্তের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। ম্যালেরিয়া রোগীকে যখন এই মশা কাঁমড়ায় তখন তার মাধ্যমেই জীবাণুটা ছড়িয়ে পড়ে আবার আরেকজনের শরীরে। মশার দৌরত্ব কমাতে পারলেই যেহেতু এই রোগের বিস্তার থামানো সম্ভব তাই অনেক সময়ই ম্যালেরিয়া আক্রান্ত জায়গাগুলোতে কীটনাশক ডিডিটি পাউডার ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ডিডিটি হচ্ছে এক ধরণের মারাত্মক স্নায়বিক বিষ, মশার ঘাঁটিগুলোতে প্রথমবারের মত ডিডিটি ছড়ানোর সাথে সাথে মশার সংখ্যা এবং সেই সাথে ম্যালেরিয়ার প্রকোপও আশাতীতভাবে কমে যায়। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে কয়েক দশক আগে ইন্ডিয়া, বাংলাদেশসহ আমাদের এলাকায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমিয়ে

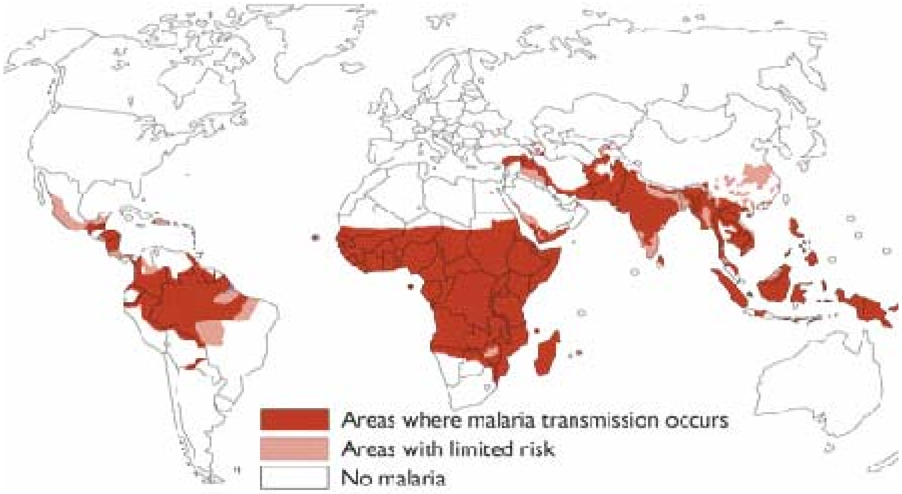

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার বিস্তার। সৌজন্যঃ (প্যান আফ্রিকান ম্যালেরিয়া কনফারেন্স-২০০৫)
http://www.mim.su.se/conference2005/eng/registration.html

আনা গেলেও এখন আবার নতুন করে তা ফিরে আসতে শুরু করেছে। ষাটের দশকে বিশ্বব্যাপী ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা কমিয়ে ৭৫ মিলিয়নে নামিয়ে আনা হয়েছিলো, অথচ এখন তা বেড়ে আবার ৩০০-৫০০ মিলিয়নে দাড়িয়েছে। তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে কেনো আবার প্রতি বছর প্রায় বিশ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে এই মারাত্মক রোগে? কেনো আবার নতুন করে ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ দেখা দিতে শুরু করেছে বিশ্বজুড়ে? আর কিছুই নয়, এখানেও আমরা দেখছি সেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের খেলা! যেমন ধরুণ,

চল্লিশের দশকের দিকে ইন্ডিয়ায় প্রথমবারের মত ব্যাপকভাবে ডিডিটি ব্যবহার করার পর প্রায় ১০-১২ বছর ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ এক্কেবারেই কমে গিয়েছিলো। তারপর কি হল? তারপর এক দশক বাদে দেখা গেলো, এতে আর কাজ হচ্ছে না, ডিডিটি ছড়ানোর সাথে সাথে, কয়েক মাসের মধ্যেই ডিডিটি প্রতিরোধক মশার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে অকল্পনীয়ভাবে। এখন অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, ডিডিটি ছড়ানোর সাথে সাথেই ডিডিটি প্রতিরোধক মশার পাল সৃষ্টি হয়ে যায়। ১৯৫৯ সালের দিকে প্রথমবারের মত ইন্ডিয়ায় এই ডিডিটি প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন মশা দেখতে পাওয়া গেলো। কিভাবে তাহলে সৃষ্টি হল এই ডিডিটি প্রতিরোধক মশার? সেই একই নিয়মে, বিবর্তনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের পথ ধরেই। সব জীবের মতই মশার মধ্যেও বিভিন্ন ধরণের বৈশিষ্ট্য এবং প্রকারণ রয়েছে। সাধারণ অবস্থায় মশকপুঞ্জের মধ্যে ডিডিটি প্রতিরোধক মশা সংখ্যায় খুব কম থাকে, কোন একধরণের মিউটেশন থেকেই হয়তো এক সময় এই প্রকারনটির সৃষ্টি হয়েছিলো। সাধারন অবস্থায় ডিডিটি প্রতিরোধে অক্ষম অংশটিই প্রকৃতিতে বেশী যোগ্য হিসেবে পরিগনিত হয়, তাই তাদের সংখ্যাও থাকে অনেক বেশী। ডিডিটি ব্যবহার করার সাথে সাথেই এই অংশটি মরে যায় কিন্তু বেঁচে থাকে শুধু সেই সংখ্যালঘু মশাগুলো যাদের মধ্যে ডিডিটি প্রতিরোধক ক্ষমতা রয়েছে। আর তার ফলে যা হবার তাই হয় - গুটিকয়েক এধরণের মশাগুলোই শুধু প্রাণে বেঁচে যায় যাদের জীনের মধ্যে রয়েছে ডিডিটি প্রতিরোধক ক্ষমতা। এরাই শুধু বংশ বৃদ্ধি করে পরবর্তী প্রজন্ম তৈরি করে এবং সংখ্যায় ফুলে ফেপে উঠতে থাকে। বেশ কিছু সময় পর স্বভাবতই দেখা যায় যে, মশার নতুন জনপুঞ্জের বেশীরভাগের মধ্যেই ডিডিটি প্রতিরোধক ক্ষমতা রয়েছে এবং যতই ডিডিটি ছড়ানো হোক না কেনো তাতে আর কোন কাজ হচ্ছে না।

একই রকম উদাহরণ দেখা যায় জমিতে কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও। বারবার একই ওষুধ জমিতে দিতে থাকলে বেশীরভাগ দূর্বল পোকাগুলো মরে যায় কিন্তু কীটনাশকের ক্রিয়া প্রতিরোধে সক্ষম কিছু শক্তিশালী পোকা-মাকড় রয়ে যায় বংশবৃদ্ধি করার জন্য। ব্যকটেরিয়ার মত জমির এই পোকাগুলোও দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। অন্যদিকে ওষুধের কোম্পানীগুলোও দিন দিন আরও কড়া ওষুধ বের করতে থাকে এদেরকে দমন করার জন্য। এর ফলে একসময় দেখা যায় যে, জমিতে খুব বেশী কড়া ওষুধ প্রয়োগ করা ছাড়া আর কোন কাজই হচ্ছে না। আর অন্যদিকে যত তাড়াতাড়ি আমরা আরও জোড়ালো কীটনাশক ব্যবহার করি না কেন দেখা যায় তারা খুব কম সময়ের মধ্যেই বিবর্তিত হয়ে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে ফেলছে। একটা মজার উদাহরণ দেওয়া যাক এখানে। নিউ ইয়র্কে প্রথমবারের মত যখন আলুর মধ্যে একধরনের গুবড়েপোকা ***কোলারাডো পটেটো বিটেল*** (*Leptinotarsa septemlineata)* কে মারার জন্য ডিডিটি ব্যবহার করা হয় তখন পোকাগুলোর লেগেছিলো ৭ বছর এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে। তারপর তাদেরকে দমন করার জন্য আরও শক্তিশালী azinphosmethyl যখন জমিতে ছড়ানো হল তখন তারা একে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা অর্জন করে ফেললো ৫ বছরে। এর পরে আরও শক্তিশালী carbofuran এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করতে সময় লেগেছিলো ২ বছর, আর সম্প্রতি অত্যন্ত কড়া কীটনাশক ওষুধ pyrethroids এর বিরুদ্ধে লেগেছে মাত্র এক বছর (৭)।

এভাবে দিনের পর দিন শক্তিশালী কীটনাশক তৈরি করে আমরা আমাদের স্বাস্থ্যের এবং পরিবেশের কি পরিমান ক্ষতি করে চলেছি তা বোধ হয় ভেবে দেখার সময় হয়েছে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই পোকা মাকড়, ব্যকটেরিয়াগুলো প্রকৃতিতে যেন রাজার হালে রাজত্ব করেছে, কোন ধরনের

প্রতিরোধের স্বীকার হয়নি, তাই তাদের বিবর্তন ঘটেছিলো অন্য নিয়মে। প্রকৃতির খেয়াল খুশী মত। এখন গত অর্ধ শতাব্দী ধরে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ এবং কীটনাশকের সামনে টিকে থাকার দায়ে তারা আমাদের চোখের সামনেই প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে মানুষের সৃষ্টি করা কৃত্রিম কারনে।

ব্যাকটেরিয়াজনিত অসুখ সারানোর জন্য আমাদের প্রজন্ম অ্যান্টিবায়োটিককে একধরণের অপ্রতিরোধ্য অস্ত্র হিসেবেই ধরে নিয়েছিলো, কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার ক্রমাগত বিবর্তনের ফলে তা আজকে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে তা একটু ঝালিয়ে নিলে কিন্তু মন্দ হয় না। যথেচ্ছ ওষুধের ব্যবহারের পরিনতি কি হতে পারে তার এক মোক্ষম উদাহরণ হচ্ছে আমাদের চোখের সামনে ঘটা এই ব্যাকটেরিয়ার বিবর্তন।

ব্যাকটেরিয়ার বিবর্তন, অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং অপ্রতিরোধ্য 'সুপার বাগ'

একজন ভাল ডাক্তার অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার সময় রোগীকে পই পই করে বলে দেন ওষুধের সবকটি ডোজ যেনো সে শেষ করে এবং সতর্ক করে দেন তিন চার দিন পর একটু ভালো লাগলেই ওষুধটা খাওয়া যেনো ছেড়ে না দেয়। তিন চার দিনের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক শরীরের ভিতরের বেশীরভাগ ব্যকটেরিয়া মেরে ফেলে বলেই আমরা এত তাড়াতাড়ি সুস্থ বোধ করতে থাকি। এখন যদি হঠাৎ করে কেউ ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দেয় তাহলে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী এবং অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতি অনেক বেশী প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন বাকী ব্যকটেরিয়াগুলো আমাদের শরীরের ভিতরে রয়ে যাবে। এরাই তারপর বংশবৃদ্ধি করবে এবং পরবর্তী জেনেরেশনের ব্যকটেরিয়ায় তাদের জীনই প্রবাহিত হবে (ব্যকটেরিয়া কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বংশবৃদ্ধি করে)। ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা যাবে যে সেই রোগী আবার নতুন করে অনেক বেশী অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং এইবার আগের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ওষুধেও আর কাজ হচ্ছে না। প্রথমবার সবটুকু ওষুধ খেলে হয়ত সবগুলো ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলা সম্ভব হত, এখন হঠাৎ করে ওষুধটা খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার ফলে শুধুমাত্র ওষুধ প্রতিরোধকারী শক্তিশালী ব্যাকটেরিয়াগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা হলো।

একই পরিণতি লক্ষ্য করা যায় যখন ফ্লু বা ঠান্ডা লাগলে আমরা ডাক্তারকে *টেট্রাসাইক্লোন* জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার জন্য জোড়াজুড়ি করতে থাকি। ইনফ্লুয়েনজা বা ঠান্ডার কারণ ভাইরাস, ব্যকটেরিয়া নয়; আর অ্যান্টিবায়োটিক শুধুমাত্র ব্যকেটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে এবং ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এর কোন ভুমিকাই নেই। ফ্লু বা ঠান্ডার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিক তো কোন কাজে লাগেই না, বরং আমাদের শরীরের ভিতরের দুর্বল ব্যকটেরিয়াগুলোকে মেরে ফেলে শক্তিশালী কিছু ব্যকটেরিয়াকে জিইয়ে রাখতে সহায়তা করে। তারপর ক্রমশঃ অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতি অনেক বেশী প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন এই ব্যাকটেরিয়াগুলো আমাদের শরীরে বংশবৃদ্ধি করে এবং ভবিষ্যতে অসুস্থ হলে আরও কড়া অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া কোন কাজ হয় না। বাংলাদেশের অনেক ডাক্তারই যে কোন অসুখের চিকিৎসায় অপ্রয়োজনীয়ভাবে অ্যান্টিবায়োটিক এবং একাধিক ওষুধ দিয়ে থাকেন। যেনো ভাবটা হচ্ছে, একটা না একটা ওষুধ তো কাজ করবেই। কিন্তু এর ফলে রোগীর শরীরে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং

ভবিষ্যতে রোগ সারানোর জন্য অনেক কড়া ওষুধের প্রয়োজন হয়।

এতো গেলো একটা দিক, এরই আরেকটা ভয়াবহ দিক নিয়ে বিজ্ঞানীরা আজকাল বেশ দুশ্চিন্তায়ই পড়তে শুরু করছেন বলেই মনে হয়। আপনারা সুপারম্যান, সুপার গার্লের সিনেমা দেখছেন, কিন্তু কখনও কি সুপার বাগ বা সুপার ব্যকটেরিয়ার নাম শুনেছেন? গত অর্ধ শতাব্দী ধরে অ্যন্টিবায়োটিকের ব্যাপক ব্যবহার যেমন লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছে তেমনিভাবে তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে আজকে দেখা দিচ্ছে 'সুপার বাগ'। এমন কিছু ব্যকটেরিয়ার সৃষ্টি হয়েছে যাদের উপর আজকের সবচেয়ে কড়া অ্যন্টিবায়োটিকটাও আর কাজ করছে না। আমরা যত শক্তিশালী অ্যন্টিবায়োটিক ব্যবহার করছি, ততই পাল্লা দিয়ে তারা বিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধি ঘটে অত্যন্ত দ্রুত, তাদের মিউটেশনের হারও অত্যাধিক আর তার ফলে তাদের মধ্যে বিবর্তন ঘটতে থাকে অকল্পনীয়ভাবে দ্রুত গতিতে। মানুষের সাথে তুলনা করলে বোঝা যায় কত তাড়াতাড়ি ব্যকটেরিয়ার বিবর্তন ঘটছে। শিকাগো ইউনিভারসিটির প্রফেসর রবার্ট ডম একবার বলেছিলেন ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে যে বিবর্তন ঘটতে লাগে ২০ মিনিট মানুষ প্রজাতিতে সেই বিবর্তন ঘটতে লাগে ২০ বছর (৮)।

প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মেই অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে বেঁচে থাকার জন্য মিউটেশনের মাধ্যমে বিবর্তিত হয়ে তারা আজকে এমন অবস্থায় পৌছেছে যে, তারা সব ধরনের ওষুধই প্রতিরোধ করে টিকে থাকতে পারে। জানা গেছে, *Staphylococcus aureus* নামের ব্যকটেরিয়াটি এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে শক্তিশালী অ্যন্টিবায়োটিক Vancomycin এর বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছে। ডিসকভারি পত্রিকার বিশেষ এক প্রতিবেদনে (Vol 27, No1) দেখা যাচ্ছে যে, ইরাকে যুদ্ধরত প্রায় ৩০০ আমেরিকান সৈন্যের মধ্যে ২০০৩ সাল থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে এক ধরণের ব্যকটেরিয়া জনিত ইনফেকশন দেখা দিয়েছে যা কোন প্রচলিত ওষুধ দিয়েই সারানো যাচ্ছে না, এই ব্যকটেরিয়াগুলো বিবর্তিত হয়ে অ্যন্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে এতখানিই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে যে ডাক্তাররা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন এদের চিকিৎসা করতে। ইতিমধ্যেই ৫ জন সৈন্য মৃত্যবরণ করেছে এই রোগে। ডাক্তাররা ভয় পাচ্ছেন যে জীবাণুগুলোর খুব দ্রুত বিবর্তনের কারণে হয়তো খুব তাড়াতাড়িই আমরা এদের মোকাবিলা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবো।

যে টিবি রোগ পৃথিবী থেকে নির্মুল হয়ে গিয়েছিলো বলে আমরা ধরে নিয়েছিলাম তা এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পুরো দমে ফিরে এসেছে, রাশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় এখন নতুন করে টিবি রোগের উৎপাত শুরু হয়েছে, যার উপর আগের কোন অ্যন্টিবায়োটিকই আর কাজ করছে না। ডাক্তাররা এখন রোগীর ফুসফুসের আক্রান্ত টিস্যুগুলোকে কেটে ফেলে দিয়ে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করছেন। আজকে আমেরিকার বিভিন্ন হাসপাতালে এমন কিছু ব্যাকটেরিয়া দেখা দিয়েছে যাদের মধ্যে সবচেয়ে কড়া অ্যন্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ ক্ষমতা দেখা দিয়েছে। হাসপাতালগুলোতে স্বাভাবিকভাবেই সবচেয়ে বেশি অ্যন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়, ফলে সেখানে ব্যকটেরিয়াগুলোও বিবর্তিত হয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করতে থাকে। আজকে হাসপাতালগুলোতে রোগীরা এক রোগ নিয়ে আসছেন আর হাসপাতাল থেকেই আক্রান্ত হচ্ছেন আরেক ধরনের এই অপ্রতিরোধ্য ব্যকটেরিয়া দিয়ে। Dr. L. Clifford McDonald আমেরিকার সরকারী এক জার্নালে সম্প্রতি এ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, "I don't want to scare people away from using antibiotics..... But it's concerning, and we need to respond," (৮).

বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন কামান গোলার মত অ্যান্টিবায়োটিককে অস্ত্র হিসেবে যত্রতত্র ব্যবহার না করে বরং এখন আমাদের প্রয়োজন বিভিন্ন ব্যকটেরিয়া, ভাইরাস এবং অন্যান্য জীবাণুর বিবর্তনের গতিটাকে ঠিক মত বোঝা এবং বিশ্লেষন করা। তার উপর ভিত্তি করে পরিবেশের দূষন কমানো, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করা ইত্যাদির মাধ্যমে একসময় হয়তো আমরা এদের বিবর্তনের গতিটাকেই ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হতে পারি। তখন হয়তো দেখা যাবে এই জীবাণুগুলোর ক্ষতিকর দিকটা বিবর্তিত হয়ে এতখানিই কমে গেছে যে, এরা আর মানুষের প্রাণহানির কারন হতে পারছে না। (১৭)

ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত আফ্রিকায় কেনো ভয়াবহ সিকেল সেল (Sickle Cell) রোগের জীনের ছড়াছড়ি?

আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে যে সিকেল সেল এ্যনেমিয়া (রক্তাল্পতা) রোগের বিষম প্রকোপ দেখা যায় তার সাথে ম্যলেরিয়া রোগের একটা আশ্চর্যরকম সম্পর্ক রয়েছে। আসুন দেখা যাক প্রকৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এধরণের চাক্ষুষ উদাহরণগুলো কিভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মুলনীতিটাকে আমাদের সামনে তুলে ধরছে।

আফ্রিকা এবং ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সিকেল সেল এ্যনেমিয়া নামের এই ভয়াবহ রোগটার কারণ আর কিছুই নয়, মানুষের শরীরে একধরণের ত্রুটিপূর্ণ হিমগ্লোবিনের কারণে এই রোগের সৃষ্টি হয় এবং তারপর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। হিমগ্লোবিন নামের এই জটিল অনুটির সাহায্যেই আমাদের রক্তের ভিতরের লোহিতকনিকাগুলো (red blood cells) শরীরের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন সরবরাহ করে। চারটি পাকানো পলিপেপটাইড চেইনের সমন্বয়ে একটি হিমোগ্লোবিন কণার সৃষ্টি হয় - তার মধ্যে দুটি আলফা চেইন এবং আর অন্য দুটি হচ্ছে বেটা চেইন। প্রত্যেকটি আলফা চেইনের মধ্যে ১৪১ টি এমাইনো এসিড আর প্রত্যেকটি বেটা চেইনের মধ্যে ১৪৬ টি এমাইনো এসিড থাকে, অর্থাৎ আমাদের একটি হিমোগ্লোবিন কণার মধ্যে ৫৭৪ টি এমাইনো এসিড থাকে । সুস্থ হিমোগ্লোবিন 'A' এবং সিকেল সেল হিমোগ্লোবিন 'S' এর মধ্যে গঠনগত পার্থক্য খুবই সামান্য; বেটা চেইনের ভিতরে গ্লুটামিন (Glutamin) নামের এমাইনো এসিডটি 'ভ্যালিন'(Valine) নামক এমাইনো এসিড দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়ে গেলেই অসুস্থ এই হিমোগ্লোবিনের সৃষ্টি হয়। হ্যা, ব্যাপারটা একটু গোলমেলেই বটে! ৫৭৪ র টির মধ্যে মাত্র একটা এমাইনো এসিড বদলে গেলেই কি এক ভয়াবহ রোগের জন্ম হয়ে যাচ্ছে আমাদের দেহে! সিকেল সেল হিমোগ্লোবিনগুলো রক্তের ভিতরের লোহিতকনিকাকে বিকৃত করে ফেলে, সাধারণ অবস্থায় এরা দেখতে চাকতির মত হলেও এই রোগের ফলে তারা কাস্তের মত আকার ধারণ করে বসে। আর গোল বাঁধে সেখানেই। এই বিকৃত আকারের লোহিতকনিকাগুলো ছোট ছোট রক্তনালীগুলোর মুখ আটকে দেয়। আর আমাদের শরীর তখন প্রতিক্রিয়া হিসেবে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এই অস্বাভাবিক

কোষগুলোকে ধ্বংস করে দিতে শুরু করে এবং তার ফলশ্রুতিতেই রোগীর শরীরে রক্তাল্পতা (Anemia) দেখা দেয়। সিকেল সেল এনেমিয়ায় আক্রান্ত কোষগুলো মাত্র ৩০ দিন বেঁচে থাকে, যেখানে রক্তের সুস্থ লোহিতকনিকাগুলো বেঁচে থাকে ১২০ দিন। অ্যানেমিয়ার কারণে এই রোগে আক্রান্ত শিশুরা খুব সহজেই বিভিন্ন ধরণের সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে(৯)।

আমরা জানি যে, আমাদের দেহ কোষে প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যের জন্য যে দুটি করে জীন রয়েছে তার একটি আসে মার কাছ থেকে আর আরেকটি দেয় বাবা। যারা বাবা এবং মা দুজনের কাছ থেকেই সিকেল সেলে আক্রান্ত হিমোগ্লোবিনের জীন পায় তারাই এই রোগ নিয়ে জন্মায় এবং শিশু বয়সেই মৃত্যবরন করে। আর যাদের মধ্যে একটি স্বাভাবিক জীন এবং আরেকটি অসুস্থ জীন থাকে তাদের মধ্যে এই রোগের বৈশিষ্ট্য থাকলেও তা সব সময় চোখে ধরা পরে না বা এত চরম আকার ধারণ করে না। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এরা সুস্থভাবে জীবন যাপন করে, শুধুমাত্র কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে এ্যনেমিয়ার লক্ষণ দেখা যায়। পশ্চিম এবং মধ্য আফ্রিকায় প্রচুর সিকেল সেল এ্যানেমিয়ার রুগী দেখা যায়, এমনকি এমনও দেখা গেছে কোন কোন গোষ্ঠীর শতকরা ৩০% লোকই এই রোগে আক্রান্ত। বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানীরা স্বভাবতই প্রশ্ন করলেন, কেমন করে একটা জনপুঞ্জের মধ্যে এরকম মারাত্মক একটি বিকৃত জীন এত বেশী হারে টিকে থাকতে পারলো? প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মে কি এর অনেক আগেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল না? আর এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই বিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ এক তথ্য আবিষ্কার করলেন।

ভৌগলিকভাবে সিকেল সেল এনেমিয়ার জীনের বিস্তৃতির প্যাটার্নটা খেয়াল করলে একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করা যায় - যে যে এলাকায় এই রোগটি দেখা যায় ঠিক সেই সেই এলাকায় এবং তার আশে পাশে ম্যালারিয়া রোগেরও প্রকোপটাও বড়ো বেশী। দীর্ঘদিনের চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণা থেকে দেখা গেলো যে, যাদের কোষের মধ্যে মাত্র একটি সিকেল সেল এ্যনেমিয়ার জীন থাকে (আরেকটি সুস্থ জীন) তাদের ম্যালেরিয়া প্রতিরোধকারী ক্ষমতা দুটি সুস্থ জীনের অধিকারী লোকদের চেয়ে অনেক বেশী। কি অদ্ভুত না ব্যাপারটা? কোন একসময় কোন এক মিউটেশনের ফলশ্রুতিতে হয়তো আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে এই বিকৃত

প্রথম ছবিতে (সবুজ রং)আফ্রিকা, ইওরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার বিস্তার দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় ছবিতে নীল রং দিয়ে দেখানো হয়েছে সিকেল সেল এনেমিয়া রোগের বিস্তার, নীল রং যত বেশী গাঢ়ো ততই প্রকোপ বেশী সেখানে এই রোগের। সৌজন্যঃ http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/history_19

জীনটা ছড়িয়ে পড়েছিলো। প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম মেনে দেখা গেলো, যে অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশী সেখানে সিকেল সেল এনেমিয়ার একটা জীন ধারণকারী লোকের টিকে থাকার ক্ষমতাও বেড়ে

যাচ্ছে, কারণ হিমোগ্লোবিনের এই রোগ বহনকারী জীনটা ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধে বেশী কার্যকরী ভুমিকা রাখতে পারছে। অন্যদিকে যাদের মধ্যে দুটিই সুস্থ জীন রয়েছে তারা ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে অনেক বেশী হারে। তাহলে এখন প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মে এখানে কি ঘটার কথা? হ্যা, এই ত্রুটিপূর্ণ জীনবহনকারী মানুষগুলোই শেষ পর্যন্ত ম্যালেরিয়া রোগের চোখ রাঙানীকে উপেক্ষা করে বেশীদিন টিকে থাকতে পারছে এবং বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে। তার ফলে যা হবার তাই হল, টিকে থাকার দায়েই শত শত প্রজন্ম পরে দেখা গেলো আফ্রিকাবাসীদের একটা বিশাল আংশের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে বিকৃত সিকেল সেল এনেমিয়ার জীন। কি চমৎকার একটি উদাহরণ ডারউইনের দেওয়া সেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটা বিবর্তনবাদ তত্ত্বের!

> বিবর্তনের মাধ্যমে কোটি কোটি বছরের বিভিন্ন রকমের এবং মাপের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যদি আমাদের সৃষ্টি না হত তাহলে এ ধরনের বৈশিষ্টগুলোর কোন অর্থই থাকতো না। একজন বুদ্ধিদীপ্ত সৃষ্টিকর্তা কেনো এরকম হাজারো দুর্বলতা, বিকৃতি এবং গোজামিল দিয়ে তাঁর সৃষ্টিকে তৈরী করতে যাবেন? কেনো তাকে এক রোগ সারাতে গিয়ে জন্য আরেক রোগের বীজ পুরে দিতে হবে শরীরে? কাজেই মানুষের কল্পনায় সৃষ্টি আলৌকিকত্ব দিয়ে নয়, বরং একমাত্র বিবর্তনবাদ তত্ত্বের মাধ্যমেই এই ধরনের ঘটনাগুলোকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, প্রকৃতিতে এধরনের হাজারো ঘটনা রয়েছে যা প্রচলিত ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্বই বলুন বা 'ইনটেলিজেন্ট ডিজাইন' তত্ত্ব দিয়েই বলুন - কোনভাবেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

এই দুটি পর্বে আমরা দেখলাম বিভিন্ন ধরণের মাইক্রো বিবর্তনের (microevolution) উদাহরণ যেখানে প্রজাতির ভিতরেই বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটছে। এরকম হাজারটা উদাহরণ রয়েছে আমাদের চোখের সামনেই। আমরা আগের অধ্যায়ে দেখছি যে, ভৌগলিকভাবে একটা প্রজাতির কিছু অংশ আলাদা হয়ে গেলে তাদের মধ্যে এধরণের ছোট ছোট পরিবর্তনগুলো জমতে জমতে একসময় এমন অবস্থায় দাঁড়ায় যে তারা আগের সেই বিচ্ছিন্ন অংশের থেকে এক্কেবারেই আলাদা প্রজাতিতে পরিণত হয়। তখন চাইলেও আর আগের জাতভাইদের সাথে মানে আগের স্বজাতীয় প্রানীগুলোর সাথে তাদের অন্তঃপ্রজনন আর সম্ভব হয় না; ফলে একই প্রজাতির দুই দল সম্পুর্ন দুটি আলাদা প্রজাতিতে রুপান্তরিত হয়ে যায়। এই রকম অবস্থা থেকেই ঘটে মাইক্রোবিবতনের 'বড়দা' macroevolution বা ম্যাক্রো-বিবর্তন। কোন জীবের চারিদিকের পারিপার্শ্বিকতা, বংশবৃদ্ধির এবং মিউটেশনের হার ও গতি প্রকৃতি, জীন পুলের প্রভাব ইত্যাদির অবেক কিছুর উপর নির্ভর করে এই ম্যাক্রো-বিবর্তন ঘটবে কি ঘটবে না। এটা যেমন একদশকেও ঘটে যেতে পারে আবার শত, সহস্র বা লক্ষ বছরও লেগে যেতে পারে। ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা ছাড়াও নতুন প্রজাতি তৈরি হতে দেখা গেছে, এমনকি বিজ্ঞানীরা ল্যবরেটরিতে নতুন প্রজাতির উদ্ভিদও সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। আজকে আমাদের হাতে চোখের সামনে ঘটা বেশ কিছু নতুন প্রজাতি সৃষ্টির উদাহরণ রয়েছে। বিবর্তনবাদ বিরোধীরা প্রায়ই বলে থাকেন যে, মাইক্রো-বিবর্তন ঘটতে দেখা গেলেও ম্যাক্রো-বিবর্তন নাকি কখনই দেখা যায়নি - মজার ব্যাপার হচ্ছে তাদের অন্যান্য

প্রচারণাগুলোর মতই এটাও একেবারেই উদ্দেশ্যপ্রনোদিত এবং মিথ্যা। এর পরের পর্বে এধরণের কিছু উদাহরণ নিয়েই আলোচনা করার আশা রইলো।

চলবে........

জানুয়ারী ২৬, ২০০৬

লেখক পরিচিতিঃ বন্যা (রাফিদা) আহমেদ বর্তমানে আমেরিকায় পাবলিক হেলথ সেকটরে সিস্টেম অ্যানালিস্ট হিসেবে কর্মরত। এর আগে কাজ করেছেন টেলি কমিউনিকেশনস ইন্ডাসট্রিতে, ফাইবার অপটিক্সের নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে প্রায় ৭ বছর। লেখাপড়া করেছেন বায়োটেকনলজি এবং কম্পিউটার সায়েন্সে। ইমেইল : bonna_ga@yahoo.com